**ডাকাতের বৌ**

অতনুরা তিন ভাই। অনিরুদ্ধ, অভিরুপ এবং অতনু।

অদ্রিজা সকলের প্রিয় বোন। অনিরুদ্ধের ছোট। বিয়ে করে স্বামী সংসার নিয়ে থাকত ঢাকার এক অভিজাত এলাকায়। স্বামীর মস্ত বড় ব্যাবসা।

`অ` দিয়ে মিল করা নামগুলি দিয়েছে অতনুর দিদা। ছেলেদের নামগুলি পছন্দ হয়েছিল অতনুর মা এবং বাবার। কিন্তু অদ্রিজা নামের মানে বুঝতে পারেননি বলে বাবা প্রথমে বাঁধ সাধেন।

–“এতো কঠিন নাম কেন? এর মানেই বা কী?”

ধমকের সুরে মাথা নাড়িয়ে ফোঁকলা দাঁত কেলিয়ে অতনুর দিদা বেশ কায়দা করে ধমক দিয়ে উঠলেন-"বাংলা শব্দের মানেই মগজে যায় না ক্যা? জানবা কেনে, ধর্ম করম তো আর নাই? পার্বতীর কথা শুইনা নাই। ধর্মে পড়স নাই, রাজা হিমাবতর কন্যা আছিল পার্বতী। আর ওর জন্ম হইছিল পাহাড়র উপ্রে। তাই তো পার্বতীকে 'পাহাড়র কন্যা' বলে। আমাদের দিদাও পার্বতীর থেইক্যা কম কিসে?"

মায়ের ধমক খেয়ে মাথা নীচু করে বাধ্য বালকের মত সেখান থেকে সরে পরে কিছু না বলে।

ভাই-বোনদের সবার ছোট অতনু। একুশে পা ছুঁই ছুঁই করছে।

চারিদিকে তখন পাক বাহিনীর উন্মাদনা। পুড়ছে গ্রামের পর গ্রাম। ২৫শে মার্চের ভয়ানক রাত্রির কথা যোগেন মহাপাত্র কিছুতেই ভুলতে পারছে না। ঢাকায় গিয়েছিলেন কোন একটা জরুরী কাজে। মেয়ের বাড়ীতেই উঠেন। সেই ভয়ানক রাত্রির নিশংস হত্যাযজ্ঞের দুই দিন পর জীবনটাকে বাজী রেখে কোন রকমে নানা কায়দায় ঢাকা ছেড়ে নিজের গ্রামে চলে আসেন। অতনুর বাবা যোগেন মহাপাত্র। এক সময় পিতামহের বিশাল হাঁক ডাক ছিল। বেশ নামী-দামী জমিদার ছিলেন অত্র এলাকায়। আজ জমিদারিত্ব না থাকলেও আছে হাঁক ডাক আর জমিদারী কায়দা-কানুন, আচার-আচরন, পোশাক-আশাক, পেয়াদা-গোমস্থা আর উৎসব-অনুষ্ঠান। বিশাল সম্পদের মালিক যোগেন মহাপাত্রের পরিবার। অধিকাংশই বাপ-দাদার আমলের। কয়েক প্রজন্ম বসে বসে খেলেও ফুরাবার নয়। তিনটি বিশাল দিঘী সহ পাঁচটি সান পাথরে ঘাট বাঁধানো পুকুড় রয়েছে এলাকায়। রয়েছে বিশাল গরুর বহর। এক নামে চিনে যোগেন মহাপাত্রকে অত্র অঞ্চলে।

বিলুপ্ত জমিদারি যুগের স্মৃতিচারণায় যোগেন মহাপাত্র খুব যত্ন সহকারে তাঁর ধুতি ঠিক ঠাক করে পড়েন এখনো। ধুতীর একটা অংশ খুব সুন্দর করে কুচি দিয়ে ধবধবে সাদা পান্জাবির ডান পকেটে গুঁজে দেন। পায়ে খরম চড়িয়ে মুখে সুগন্ধি পান-সুপারি চিবোতে চিবোতে কর্তৃত্ব এবং ঐতিহ্যের ছাপ নিয়ে যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটেন তখন সকলেই দেখে `পেন্নাম বাবু` বলে সম্বোধন করেন। তখন যোগেন মহাপাত্র হাতের মুঠোতে রাখা অংশে সোনা বাঁধানো ঐতিহ্যময় লাঠিটা সহ ডান হাত তুলে লাল জিহ্বা আর ঠোঁট নাচিয়ে সুন্দর করে উত্তর দিবে `পেন্নাম`। যদিও আধুনিক পৃথিবীটা জমিদারের দিনগুলি থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেছে, কিন্তু তাঁর আচরণ এবং শৈলীর মাধ্যমে বাংলার সেই সময়কার অঙ্গভঙ্গি, ক্ষমতা এবং মর্যাদাকে ধরে রাখতে ভুলেনি।

সালটা ১৯৭১। সেই উত্তাল দিনগুলিতে যখন সারা বাংলাদেশ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তখন পরিবারের ছোট ছেলে, রসুলপুর গ্রামের সুদর্শন টগবগে অতনু, যে সবে মাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে তৃতীয় বর্ষের পরীক্ষা শেষ করেছে, তার জীবনে নেমে আসে এক বিষাদের ঘূর্নিঝড়। জীবন থেকে হারিয়ে যায় ভালোবাসার কোমল পদ্মটি। ভয়ঙ্কর যুদ্ধের প্রজ্বলন বুকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ে। ধ্বংসাত্মক শক্তি অতনুর হৃদয়ে এমন দাগ রেখে যায় যা কখনও নিরাময় হওয়ার নয়।

তিস্তা নদীর পূর্ব তীরে একটি ছোট গ্রামে বাস করত অতনুরা।

তিস্তার মৃদু বক্ররেখা বরাবর অবস্থিত রসুলপুর গ্রামটি নির্মল সৌন্দর্যে পরিপূর্ন। গ্রামটি, অন্য অনেক গ্রামের মতোই একটি আঁটসাঁট সম্প্রদায়ের বসতি ছিল। গ্রামের প্রত্যেকে একে অপরকে জানত, চিনত। বাসিন্দাদের অধিকাংশই ধর্মপ্রাণ হিন্দু সম্প্রদায়ের। যেখানে জীবন ছিল সহজ ও সরলতায় পূর্ন। প্রভাতের আলো ফোটার সাথে সাথে গ্রামটি মন্দিরের ঘণ্টার সুরেলা ধ্বনিতে জেগে ওঠত। প্রার্থনার জন্য যেন সকলকে আহ্বান জানাত। প্রস্ফুটিত শিউলি- জুঁইয়ের মিষ্টি সুভাষ আর নদী তীরের মাটির সোঁদা গন্ধ এলাকার নির্মল বাতাসে মিশে থাকত সবসময়। ছড়িয়ে পড়ত সারা গ্রামে, উদ্বেলিত হত মানুষের মন। গাছের পাতাদের মত তির তির করে নেচে উঠত অনেকের প্রান। খড়ের ছাউনি দেয়া বেশীর ভাগ ঘরগুলি গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল। গ্রামবাসীদের হৃদয়ে ছিল খুব দয়া। আতিথেয়তার জন্যও ছিল বেশ পরিচিতি। উষ্ণ হাসিতে পূর্ন থাকত সকলের অবয়ব। যেন দুঃখ-কষ্টের কোন বালাই নেই। আছে শুধু আনন্দ আর উচ্ছ্বাসে ভরা প্রান। নির্ভয়ে শিশুরা মাঠে খেলা করত। তাদের উৎপল হাসি যেন প্রাচীন বটগাছের পাখির গানের সাথে মিশে যায়।

নদীর ধারেই ছিল যোগেন মহাপাত্রের পূর্ব পুরুষদের তৈরী প্রাচীন ঘরোনার কারুকার্যময় একটি নাট মন্দির। এখানেই সন্ধ্যায় গ্রামবাসীরা প্রার্থনা এবং গল্প বলার জন্য জড়ো হত। উৎসব এবং আচার-অনুষ্ঠানগুলি বছরের পর বছর ধরে রঙ, সঙ্গীত এবং নৃত্যের উচ্ছ্বাস নিয়ে আসত গ্রামে। প্রতি বছর পৌষ সংক্রান্তির মেলাও বসত এ নাট মন্দিরের সামনেই। বাংলা পৌষ মাসের শেষের দিন এই উৎসব পালন করা হয় মহা ধুমধামে। নৌকা করে দূর দুরান্তের গ্রাম থেকে অনেকে আসত এ মেলায়। সুর্যোদয় থেকে শুরু কর সূর্যাস্ত পর্যন্ত চলত মেলা। ছোটবেলায় অতনুও কত আনন্দ করেছে এই মেলায়। সেই দিনে ঘরে চলত পিঠে তৈরীর এক বিশাল আয়োজন। মেলা থেকে ঘুড়ি কিনে পাশের দীঘির পারের খোলা মাঠে সাড়াদিন ঘুড়ি উড়ানোর পরে সন্ধ্যায় পটকা ফাটিয়ে ফানুস উড়িয়ে বাড়ী ফিরে পিঠা খাওয়ায় মেতে থাকত।

তবে অতনুর কাছে এ গ্রামের সবচেয়ে ভলো লাগার কারনটি ছিল `নিরুপমা`। গ্রামের যতীন মাষ্টারের মেয়ে। একই স্কুলে পড়ত। অতনুর তিন ক্লাশ নীচে। প্রথম চোখা চোখী হয় রাজদীঘির ঘাটলায়। দীঘির পাশের রাস্তা দিয়েই সেদিন হেঁটে যাচ্ছিল অতনু। দীঘির ঘাটেই দীঘির জলে পা ডুবিয়ে মনের সুখে কথা বলছিল বান্ধবীর সাথে। সূর্য ডুবে ডুবে। মৃদু মন্দ বাতাসে দীঘির জলে ঢেউ খেলে হেলে দোলে, কালো লম্বা চুলে আছড়িয়ে পড়ছে বাতাস।

হঠাৎ এমন সুন্দর দৃশ্যে অতনুর পা মাটিতে আটকে যায়। এর আগেতো কখনো এমন দেখেনি! অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ওদের দিকে। তবে মুখটা তখনো ভালো করে দেখতে পারেনি। ঘন কালো চুল ডান দিকের মেয়েটির ঘাড় বেয়ে ঘাটের সিঁড়িতে পড়ে আছে। হঠাৎ নিরুপমা ঘাড় ফিরাতেই অতনুর দুচোখ লজ্জায় আরষ্ঠ হয়ে যায়, বুকটা তিনশ মাইল বেগে চলা ট্রেনের ধুক ধুক আওয়াজে উঠা নামা করতে থাকে। নিরুপমাও অবাক হয়ে যায়। অতনু তাড়াতাড়ি মুখ ঘুড়িয়ে তর তর করে নিজের মত চলতে থাকে সামনের দিকে।

দ্বিতীয় বার দেখ হয় স্কুলের কড়িডোরে।

আগে মেয়েদের জন্য আলাদা কমন রুম থাকত। সেখানেই সব ক্লাশের মেয়েরা অপেক্ষা করত। শিক্ষক ক্লাশে যাওয়ার সময় কমন রুমের সামনে এসে হাঁক দিত `ক্লাশ` সেভেন। তখন সেভেনে পড়ুয়া মেয়েরা শিক্ষকের পিছু পিছু ক্লাশে যেত। ক্লাশে মেয়েদের জন্য বসার জায়গাটাও আলাদা ছিল। সেদিন নিরুপমা ক্লাশে যাচ্ছিল। এমন সময় পাশের কড়িডোড় থেকে অতনু বেড়িয়ে আসে। সামনে দিয়ে আসা নিরুপমাকে দেখতে পায়নি। হঠাৎ কড়িডোড়ের বাঁকে এসে সবার পেছনে থাকা নিরুপমার সাথে ধাক্কা লেগে যায়। নিরুপমার হাত থেকে বইগুলি ছিটকে পড়ে মেঝেতে। তারপরের ঘটনাগুলো খুব এগুতে থাকে দ্রুত।

দুজনের মধ্যে বলাবলি হয়। দেখা-দেখি হয়, কথা-বার্তা চলে স্কুলে চুপি চুপি। তারপর স্কুলের গন্ডিপেড়িয়ে বিলের ধারে, ঝিলের পাড়ে, কদম তলায়, রাজ দীঘির ঘাটে। কখনো বা সজনে তলায় আম খাওয়ার ছলে। আবার কখনো বা অতনুদের কাঁঠাল বাগানে কোন এক অলস বিকেলে। অতনুর ভাললাগে নিরুপমার সঙ্গ। ভালোলাগা থেকে ভালোবাসা। এমনি করেই কেটে গেল প্রায় ছটি বছর। মাধ্যমিক শেষ করে অনেক দুরের কলেজে ভর্তি হয় অতনু। এক সময় চলে যায় শহরে। নিরুপমা এখন বড়ো হয়েছে। সেও কলেজ শেষ করেছে। বাবা বলেন-`তোর বিয়ের একটা ব্যাবস্থা করতে হবে`।

মেয়ে তখন রাগ করে বলবে-`আমি কি তোমার বোঝা বাবা?` আমি পড়তে চাই। আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে দাও প্লিজ।`

বাবা তখন মেয়ের থুতুনি ধরে হাসতে হাসতে বলেন-“ঠিক আছে, তাই হবে মা।“

এখানেই অতনু ও নিরুপমা খুঁজে পেয়েছিল জীবনকে ভালোবাসার প্রকৃতির সৌন্দর্য।মানবিক সহানুভূতির এক সুরেলা সংমিশ্রণ অনুরনিত হয়েছিল দুজনের হৃদয়ে। একটি ছোট অভয়ারণ্য যেখানে তিস্তার ধারে হৃদয় শান্তি পায়, ভালোবাসা খুঁজে পায়। অতনুর দিনগুলি ছিল তারুণ্যের স্বপ্নে ভরা। নিষ্পাপ আনন্দ আর হাসির অমলিন উচ্ছ্বাস ভাগ করে নিতো তার প্রিয় ভালোবাসা স্বপ্নের কেশরী নিরুপমার সাথে। নিরুপমা ছিল অতনুর জীবনের আলো, চলার গতি, শব্দের জলকেলী, জীবনের সুর সঙ্গীত। তার হাসি ছিল বিটুফেনের সুরের আওয়াজ যা অতনুর সমস্ত উদ্বেগকে তাড়িয়ে দিত। তার উপস্থিতিতে অতনু যেন খুঁজে পেত বিশৃঙ্খলতার প্রান্তে বিধ্বস্ত বিশ্বে একটি স্বস্তিদায়ক আশ্রয়স্থল।

আশে পাশের সব গ্রামের সাথেই ছিল রসুলপুর বাসীদের বেশ সখ্যতা। তার কারন অবশ্য যোগেন মহাপাত্র। তার সামাজিক কর্মকান্ডের জন্যই সকলের সন্মানীত তিনি। এই অঞ্চলের সকলেই কোন না কোন ভাবে উপকৃত হয়েছেন যোগেন মহাপাত্রের দয়া-দাক্ষিন্যে। সমাজ থেকে যেমন কোন কার্পন্য ছাড়াই দুহাত ভরে নিয়েছেন তার পিতা-প্রপিতামহগন ঠিক তেমনি যোগেন মহাপাত্র তার পূর্ব পুরুষদের ঐশ্বর্যের উপর দাঁড়িয়ে উদ্দাত্ত প্রানে কোন বৈষম্যহীন ভাবেই দুহাত দিয়ে ফিরিয়ে দিয়েছেন সমাজের মানুষগুলোকে।

কিন্তু যুদ্ধের শিখা কোন বৈষম্য করে না। ভয়ানক পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে সারা বংলাদেশে। শুরু করে তাদের জাতিগত নির্মূল অভিযান। নির্মম দক্ষতার সাথে হত্যার তীর ছুড়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে। গ্রামের পর গ্রাম জ্বালাতে থাকে। উঠতি যুবতী হিন্দু মেয়েদের উপর নজড় পড়ে নরঘাতক পাক সেনাদের। পাশের গ্রামের করিম মোল্লার নাম ছড়িয়ে পড়ে পুরো অঞ্চলে রাতারাতি। পাক বাহিনীর পরম মিত্র করিম মোল্লার নজর পরে হিন্দু মেয়েদের উপর। তুলে নিয়ে ইজ্জ্বত লুটতে থাকে। করিম মোল্লা ও তার পা চাটা সহযোগীদের সহযোগীতায় পাক সেনারা আক্রমন করে তিস্তা পারের গ্রামগুলিতে। রেহাই পায়নি অতনুদের গ্রামও। গুলির আওয়াজে, নিরীহদের কান্নায় শান্ত নিস্তব্ধ রাতগুলো ভেঙ্গে খান খান হয়ে যেতে থাকে।

অতনুরা সারাক্ষন ভয়ে থাকতো। যে স্বপ্নকে বুকে নিয়ে হাসি-তামাশায় কাটাতো একদিন সেই স্বপ্নগুলি যেন হঠাৎ করেই এক দুর্ভাগ্যজনক রাতে থেমে যায়, ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। সেনাবাহিনী তাদের গ্রামে অভিযান চালানোর আগেই যোগেন মহাপাত্র তিন ছেলেকে বাড়ী থেকে ভারতের উদ্দেশ্যে পাঠিয়ে দেওয়ার ব্যাবস্থা করেন। পরে একদিন নিজের সহধর্মীনিকে নিয়ে নিজেও চলে যান।

কিন্তু ভারতে গিয়েও অতনুর মনটা অস্থির লাগছিল সরাক্ষন।

নিরুপমার জন্য মনটা কেমন ছট পট করছিল। কেমন আছে নিরুপমা? নানা ভাবনায় একদিন সবাইকে না জানিয়ে চুপি চুপি অতনু ফিরে আসে গ্রামে নিরুপমার খোঁজে।

কিন্তু গ্রামে গিয়ে জানতে পারলো পাক বাহিনীরা পুরো গ্রামে আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নিরুপমার বাবাকে ধরে নিয়ে যায়। করিম মোল্লা নিরুপমাকে চুলের মুঠি ধরে টানতে টানতে নিয়ে যায়। আর গ্রামে ফিরে আসেনি। অতনুর হৃদয় ভয় এবং যন্ত্রণায় কাঁপছে। গ্রামের এপাশ ওপাশ মরিয়া হয়ে খুঁজতে থাকে। কখনো বা নীমতলীর ঘাটে, কখনো বা রাজার দীঘির পাড়ে, সজনে তলায়। নাট মন্দিরে এসে উদাস হয়ে বসেছিল অনেকক্ষন। এখানেই একদিন নিরুপমা অতনুর বুকে মাথা রেখে বলেছিল-“যদি কখনো কোন ঝড় এসে আমাকে তোমার কাছ থেকে আলাদা করে দেয়, তুমি এক দন্ডের জন্য হলেও এখানে এসে বসো। আমার চুলের গন্ধ বাতাসে পাবে। আমি দূর থেকে তোমাকে দেখবো।“ ধুক ধুক করে কেঁদে উঠল অতনু। এদিক ওদিক তাকাল।

কিন্তু নিরুপমাকে কোথাও পাওয়া গেল না।

সারা গ্রামে তখনো আগুন জ্বলছিল। অধিকাংশ বাড়ীগুলিই পুড়িয়ে দেয়। গ্রামের একমাত্র অতনুদের দালান বাড়ী ধ্বংসস্তূপের উপর নির্মম অত্যাচারের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চারিদিকে ধোঁয়ায় ঘন বাতাস। পোড়া কাঠ ও মাংসের তীব্র গন্ধ। এই যেন এক নরক কুন্ড। বাড়ীর গোমস্থাদের কাউকে খুঁজে পেল না।

খুব অসহায় লাগছিল অতনুকে। অতনুর প্রিয় ভালোবাসা নিরুপমা তার কাছে হারিয়ে গেল। চির চেনা পৃথিবীটা হঠাৎ বদলে গেল।

শেষ পর্যন্ত জীবনকে বাঁচানোর জন্য অতনুর পালিয়ে যাওয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না। বেঁচে থাকা কয়েকজন গ্রামবাসীকে সাথে নিয়ে অতনু আবার ভারতের উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। সেই রাতেই পায়ে হেঁটে গ্রাম ছেড়ে যায় সবাই। যাত্রাটি ছিল খুবই বেদনাদায়ক। ভারতের জলপাইগুড়ি সীমান্তবর্তী শহরের উদ্দেশ্যে যাত্রা। দূরত্বও কম। এই পথেই অতনু এসেছিল ভারত থেকে।

গ্রামের পাশ দিয়েই বয়ে গেছে তিস্তা। প্রথম বড় বাধাটি হল তিস্তা নদী পার হওয়া। এই নদী, যা একসময় জীবন ও জীবিকার প্রতীক ছিল, এখন এ যেন ভয়ঙ্কর বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেতুগুলি ধ্বংস হয়ে গেছে পাক সেনাদের বোমা বর্ষনে। পারাপারের স্বাভাবিক উপায়গুলি অকার্যকর হয়ে পড়েছে, ফলে অতনুরা বাধ্য হয়ে বিকল্প উপায় খুঁজে নেয়। অস্থায়ী ভেলা বানিয়ে, যাত্রা শুরু করে। স্রোতের প্রবাহ ছিল তীব্র, পানি ছিল খুব ঠাণ্ডা। বাতাসের তীব্রতায় শারীরিক ও মানসিক চাপে ছিল দলের সবাই। সকলেই একে অপরকে আঁকড়ে ধরে থাকে আশঙ্কায় যে কখন কি হবে। সব ভয় ভীতকে পিছনে ফেলে অতনুর দল উত্তাল পানির মধ্যে দিয়ে এগিয়ে যায়।

চারিদিকে ঘোর অন্ধকার। অমাবস্যার রাত। টর্চ ছাড়া কিছুই ঠাহর করা যায় না। এক সময় তিস্তা পার হয়ে খোলা ধান ক্ষেতের ভেতর দিয়ে হাঁটতে থাকে। নিরলস পদযাত্রায় তাদের পা ফোসকা ও রক্তাক্ত হয়ে যায়। দুএকজন বয়স্ক আবার হাঁটতে পারছিল না। ক্ষুধা ও ক্লান্তিতে অনেকের শরীর দুর্বল হয়ে পড়ছিল।

অতনুরা এগিয়ে চলছে। ঝোঁপ ঝাড়, জঙ্গল, খাল-বিল কোনটাই বাদ যায়নি। দিনের বেলায় ঘাপটি মেরে সবাই কোন এক জঙ্গলে বা আঁখ খেতের ভিতরে লুকিয়ে থাকত। রাত হলেই টর্চ টিপে টিপে আবার যাত্রা শুরু। মাঝে মঝে দূরবর্তী গুলির আওয়াজ কানে এসে বাজত। সকলের বেঁচে থাকার একমাত্র ভরসা ছিল ভারতের সীমান্তে পৌঁছানো।

বৃদ্ধ, মহিলা এবং শিশু সহ অতনুরা বিশজনের একটি দল ছিল।

অমসৃণ, রুক্ষ পথে ঝাঁকড়া পাথরের উপর দিয়ে হেঁটে চলছে সবাই। খরা মসুমের দিনের জ্বলন্ত তাপ সকলের উপর নির্দয়ভাবে আঘাত করছিল। রাতের নিস্তব্ধতায় শিশু ও বৃদ্ধ মহিলারা ভয়ে শুকিয়ে যেত। খাবারের অভাবে শিশুরা কান্নাকাটি করছিল। খাবার সব ফুরিয়ে এসেছে। বন্য ফল, শাক পাতা খেতে হত মাঝে মধ্যে। কখনো সখনো উদার গ্রামবাসী কিছু চিড়া-মুড়ির সাথে গুড় দিত। তাই ভাগাভগি করে খেত। জলের অভাবে কর্দমাক্ত স্রোত থেকে জল পান করতে হয়েছে। গলা শুকিয়ে থাকত। এক ফোঁটা জলের আশায় সকলের গলা মরিয়া হয়ে থাকত।

এ কয়েকদিনেই অতনুরা অকথ্য বিভীষিকা প্রত্যক্ষ করেছে। গ্রামগুলি আগুনে পুড়ে গেছে, অসংখ মৃতদেহ পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে আছে এখানে সেখানে। কামানের আগুনের অবিরাম শব্দ দূর থেকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। কখনো কখনো মুক্তিবাহিনী যোদ্ধাদের সাথে অতনুদের দেখা হত। তাদের দৃঢ় সংকল্প এবং সাহস সকলকে অনুপ্রাণিত করত। এভাবেই চারটা দিন কেটে যায়। কিন্তু সীমান্তে পোঁছুতে পারেনি। গত কয়েকদিন অসুস্থতা এবং ক্লান্তিতে কয়েক জনকে হারিয়েছে। তাদের দেহগুলি সকলের উত্তরণের নীরব চিহ্ন হিসাবে থেকে যায়।

অতনুরা সীমান্তের কাছাকাছি আসার সাথে সাথে যাত্রা আরও বিপজ্জনক হয়ে উঠল। টহল এবং চেকপয়েন্ট মানে ক্রমাগত সতর্কতা। রাতের বেলা হেঁটে চলছে টর্চের আলোতে। সকলের পা যেন ব্যথার কাছে প্রায় অসাড় হয়ে গেছে। নিছক ইচ্ছাশক্তির কারনে সকলেই আশাকে বুকে চেপে ধরে এগিয়ে চললো। রাত কেটে ভোর হয় হয়। সামনেই এক শীর্নকায় নদী। পার হয়ে কয়েকটা গ্রাম গেলে ভারতের সীমান্ত।

নদী পার হওয়ার সময়ই বিপদটা ঘটে।

নদীর পারে এসে আরো অসংখ্য মানুষের দেখা মিললো। সবাই সীমান্তের উদ্দেশ্যে। ভোর হওয়ার বেশ আগেই বেশ কিছু নৌকা পারাপারে ব্যাস্ত হয়ে উঠে। চড়া দাম হাঁকিয়ে নেয়। এ যেন যুদ্ধের ভয়াল রাত। অতনু ও তার সঙ্গী দলটি প্রাণ হাতে নিয়ে দেশের সীমানা পেরিয়ে ভারত পৌঁছানোর আপ্রাণ চেষ্টা করছিল। তারা হতাশা ও ভয়ের মাঝে একটি পুরনো নৌকায় চেপে বসে গাদাগাদি করে। কিন্তু রাতের আঁধারে, নির্জন নদীর বুকে হঠাৎ করে সেনাবাহিনীর আক্রমণ নেমে আসে। গুলির শব্দে রাতের নীরবতা ভেঙে যায়, বাতাসে ভেসে ওঠে চিৎকার আর করুণ আর্তনাদ।

গুলির শব্দে এবং সেনাবাহিনীর চিৎকারে অতনুর মনোবল টলমল করতে থাকে, কিন্তু জীবনের তাগিদে সে থামেনি। নৌকা যখন তলিয়ে যেতে থাকে, অতনু দ্রুত নদীর ঠান্ডা পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। সাঁতারের প্রতিটি চক্রে বেঁচে থাকার জন্য লড়াই করে। নদীর স্রোত ও জলে ঢেউয়ের প্রতিকূলতা উপেক্ষা করে, হাত-পা দিয়ে জোরে জোরে জল কেটে অতনু ধীরে ধীরে তীরের দিকে এগিয়ে যায়।

অবশেষে, অনেক কষ্টের পরে, কোনোমতে তীরে এসে পৌঁছায়। ক্লান্ত শরীর নিয়ে, বুকভরা ভয় ও শোক নিয়ে, অতনু অবশেষে প্রাণে বাঁচে। পেছনে পড়ে থাকে এক ভয়ানক স্মৃতি।

খুব অপ্রত্যাশিত ভাবেই ভাগ্য যেন হস্তক্ষেপ করল।

হাঁটতে হাঁটতে অতনু এসে আশ্রয় নেয় গ্রামের এক আবাসে।

তৃষ্ণায় বুকটা ফেটে যাচ্ছিল অতনুর। সারা শরীর ভেজা। কাঁধে এখনো রেক স্যাকটি ঝুলানো আছে। ভিজে জোব জোব হয়ে গেছে। টাকা পয়সা আর কিছু মূল্যবান জিনিষপত্র এখানেই রাখা আছে।

খড়ের ছাউনি দেওয়া বাড়ীটি বেশ পুরনো।বাড়ীতে ঢুকতেই একটা খড়ের গাদা দেখতে পায়। একটি বেশ মোটা তাজা দুধ ওয়ালা গরু খড় টেনে বেশ জোয়াল চিবিয়ে চিবিয়ে খাচ্ছিল। হঠাৎ এক বিশাল দেহী উঁচু লম্বা মাথায় কুকড়ানো চুলের শ্যামবর্ন, পশমে ভর্তি সারা গা চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে বলে উঠলো-“ক্যা যায় এহানে।“

অতনুর যেন আর পা চলছে না। শরীর শীতে কাঁপছিল। ক্ষীন কন্ঠে মুখ থেকে বেড়িয়ে এলো-“আমি সীমান্তে যেতে চাই। আমাকে একটু দয়া কর। আজকের দিনটা এখানে একটু থাকতে দাও। আমার ভীষন তেষ্টা পেয়েছে।“ এ বলেই দুহাত তুলে কড়জোড়ে প্রনাম করতে গিয়ে অতনু মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

দৌড়ে এসে লোকটি ধরে।

তারপর পাশের ঘরটিতে নিয়ে যায়। তবে এই ঘরে কেউ থকে না। ঘরের অবস্থা দেখলেই তা বোঝা যায়। দু তিনটি বসার টোল ছাড়া আর তেমন কিছু নেই। এ ঘরে বসিয়ে দিয়ে লোকটি চলে যায়।

কিছুক্ষন পরেই অতনুর জন্য একটি লুঙ্গি আর পুরনো একটি পাঞ্জাবি নিয়ে আসে।

“চিন্তা করবেন না। আপনার দুঃখ হামি বুঝতে পারছি। এগুলি এহন পড়ে নেন। দিনটা এখানেই থাকবেন। অন্ধকার হলে রাতের বেলাতে ডায়না নদী পার করে সীমান্তে নিয়ে ভারতে ঢুকিয়ে দেবে আমার লোক। এখন বিশ্রাম নিন। আমি খাবারের ব্যবস্থা করতাছি।“-এ কথা শেষ করেই জোড়ে চীৎকার দিয়ে উঠলো-“বেগম, ওনার খাওয়নটা আইনা দাও। আপনি খাওয়ন দাওয়ন করে একটু আরাম কইরুন। আমি একটু বাইরে যাইতাম। ঘন্টার মত লাইগব।“

তারপর কিছুক্ষন পরেই বড়ো একটা ঘোমটা দিয়ে একজন অল্পবয়সী মহিলা এলো। এরমধ্যে অতনু লুঙ্গিটা পড়ে নেয়।

যখন ঘোমটা ঢাকা মহিলাটি চিড়া, কলা, গুড় আর পানির থালা নিয়ে এগিয়ে এলো, অতনুর চোখ প্রথমে চিনতে পারেনি। কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই যখন মহিলাটি ঘোমটা সরিয়ে তাকালো, অতনুর বুকের মধ্যে যেন বজ্রপাত হলো। এ তো তার প্রিয়তমা, তার হারানো প্রেমিকা। চোখে চোখ পড়তেই দুজনের হৃদয় একসাথে কেঁপে উঠলো। মহিলার চোখে জল, ঠোঁটে এক অচেনা কষ্টের হাসি। অতনু বিস্ময়ে স্তব্ধ, বিশ্বাস করতে পারছিল না যে তার প্রিয়তমা নিরুপমাকে এভাবে দেখবে।

“নিরুপমা”-বিস্ময়ে অতনুর কন্ঠ

“তুমি এখান থেকে এখনিই পালাও। ওরা এসেই তোমাকে মেরে ফেলবে।“-নিরুপমা কড়জোড়ে অতনুর দিকে অশ্রুশিক্ত নয়নে তাকিয়ে থাকে

“আর তুমি”-অবাক কন্ঠে অতনু বলে।

“আমি এখন রুস্তম ডাকাতের বউ রহিমা বেগম। আমার স্বামী একটা আজরাইল, মানুষ মারা কসাই। তোমাকেও আজ সে মারবে। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি এক্ষুনি পালিয়ে যাও।“ এ বলেই নিরুপমা অতনুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে। হাউ মাউ করে কাঁদতে থাকে।

দুজনের চোখে-মুখে মিশ্রিত আবেগ, ভালবাসার অশ্রু আর অপ্রাপ্তির যন্ত্রণা। মুহূর্তেই অতীতের সমস্ত স্মৃতি ভেসে উঠলো, হৃদয় বিদারক সেই দৃশ্য অতনুকে স্থবির করে দিলো।

**ড. পল্টু দত্ত**

শিক্ষক, গবেষক এবং কলামিষ্ট